ভূমিকা

স্বহৃদয়শীল মানুষ রচনা করেন সাহিত্য। সাহিত্য জিজ্ঞাসায় যিনি নিষ্ঠাবান, তিনি স্বহৃদয়শীল পাঠক বা সমালোচক। প্রতিটি মানুষের অভিপ্রায় থাকে –"কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস-বাঁদিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে। কী? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না; তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে"[১]। এই একই অভিলাষা নিয়ে একজন ঔপন্যাসিক সমাজের চারপাশে দ্রষ্টব্য নানাতর মানবিক সম্পর্ককে উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ঔপন্যাসিকরা মূলত তাঁদের লেখায় তুলে ধরতে চান মানুষের পারিবারিক ও সামজিক নানা সম্পর্ক। আর সেই সম্পর্কের বিন্যাসে মানুষ ও মানুষের মনন বেশী করে প্রাধান্য পায়। আর মননের রূপায়নে উঠে আসে ভিন্ন ধর্মী সম্পর্কের বিন্যাস। মানুষের ভিন্নতর সম্পর্কের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। মূলত দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে বেশীরভাগ উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়ে থাকে। দাম্পত্য সম্পর্কের নানাদিক বিশ্লেষণ করার জন্য 'আশাপূর্ণা দেবী'র কিছু উপন্যাস প্রেক্ষিত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির প্রেক্ষিতে যে গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেছি, সম্ভবত এই ধরনের আলোচনা পূর্বে কোন গবেষণায় আলোচিত হয়নি বলে মনে হয়। আমার গবেষণার মাধ্যমে মানুষের দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্নতা ও উৎকৃষ্টতার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষের বিবাহপরবর্তী জীবনের ঐতিহাসিক সত্যতা উল্লেখের মাধ্যমে, ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে কিভাবে, কেন ও কোন পর্যায়ে দাম্পত্য সম্পর্কের

কথা তুলে ধরেছেন। সেইসব বিষয়ের বিশ্লেষণ করে গবেষণা পত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একদিকে যেমন ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী'র পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় কিরকম দাম্পত্য সম্পর্ক রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। অন্যদিকে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের তুলনায় তাঁর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের কতটা ভিন্নতা আছে; তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সামগ্রিকভাবে আমার গবেষণাপত্রে মূলত ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসের প্রেক্ষিতে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্নতা প্রসঙ্গে একটা সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে মানুষের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কার ও সামাজিকতার বন্ধনের আড়ালে, দাম্পত্য সম্পর্কের সঠিক মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনের রসদ অনুসন্ধান করে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়ে 'আশাপূর্ণা দেবী'র ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকীর্তির কথা তুলে ধরে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ও উপলব্ধির প্রকাশ করা হয়েছে। কীভাবে একজন নারী হয়েও বিংশ শতাব্দীর করাল সমাজ ব্যবস্থায়, তিনি নিজের উদ্যোগেই ও অদম্য চেষ্টায় পড়াশোনা শিখেছেন। কত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার বিবরণ এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল, সেকথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে এই অধ্যায়ে। তিনি সমাজকে কীভাবে দেখেছেন এবং নিজস্ব উপলব্ধির মাধ্যমে সাহিত্যের পাতায় কতটা তুলে ধরেছেন? সূত্রাকারে তাই উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যিক হয়ে ওঠার ইতিহাস, ধারাভাষ্য আকারে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত। 'আশাপূর্ণা দেবী' যে সমস্ত মানুষের সাহচর্যে একজন যথার্থ সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন, তাঁদের সকলের কথা যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। মূলত একজন মরমী

কথাকারের জীবন বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবনের সন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আশাপূর্ণা দেবী' রচিত উপন্যাসগুলির সুমার্জিত পর্যায় বিভাগ করে প্রকাশকাল সহ তুলে ধরা হয়েছে। মূলত তাঁর জীবনের ধারাবাহিকতা ও সাহিত্য রচনার সময়কে প্রেক্ষিত হিসেবে নিয়ে উপন্যাসগুলোর পর্যায় বিভাগ করা হয়েছে। তিনটি পর্ব যথাক্রমে 'প্রভাত পর্ব', 'মধ্যাহ্ন পর্ব' ও 'সায়াহ্ন পর্ব' নামে শ্রেণীবদ্ধ পর্যায় বিভাগে উপন্যাসগুলোর পর্যায়ক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাতে করে ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' কোন সময়কালে কী কী উপন্যাস লিখেছেন, এবং তাঁর লেখার ধরন কেমন ছিল তা বোঝা যায়। 'প্রভাত পর্বে'র সমাপ্তি ঘটেছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র প্রকাশকাল পর্যন্ত। কারণ সূর্যের আভা যেমন প্রভাতের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্নিগ্ধ ও মধুর থাকে, তেমনি যেন 'আশাপূর্ণা দেবী'র 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাস পর্যন্ত একটা স্নিগ্ধ ধারা দেখা যায়। 'মধ্যাহ্ন পর্বে' বেশীরভাগ বিখ্যাত উপন্যাসগুলো স্থান পেয়েছে। 'বৃত্তপথ', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা', 'যুগলবন্দী', 'মায়াদর্পণ', 'বিরহী বিহঙ্গ', 'দ্বিতীয় অধ্যায়', 'নিভৃত আকাশ', 'পলাতক সৈনিক', 'বালির নিচে ঢেউ', 'সন্ধিক্ষণ' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি প্রতিনিধিস্থানীয়। এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে নারীর জীবন ও দাম্পত্য সম্পর্কের নানাবিধ পরিক্ষা-নিরিক্ষা করেছেন ঔপন্যাসিক। 'সায়াহ্ন পর্বে' ঔপন্যাসিকের জীবনের অবিজ্ঞতায় রচিত উপন্যাসগুলির প্রকাশকের নাম ও প্রকাশ কাল সহ উল্লেখ করা হয়েছে। এরকম পর্ব বিভাগের মাধ্যমে উপন্যাসের সঠিক প্রকাশকাল জানা সম্ভব হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পর্যায়ক্রমে 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসের প্রেক্ষিতে দাম্পত্য সম্পর্কের সঠিক বিশ্লেষণে এই পর্ব বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণের ক্রমপর্যায় তথ্যাকারে আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য উপন্যাস রচনার সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র সময়কাল পর্যন্ত প্রতিনিধিস্থানীয় ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের কথাই সূত্রাকারে উল্লেখিত। আর তা করতে গিয়ে স্বভাবতই মানুষের দাম্পত্যপূর্ব জীবন ও বিবাহ কেন্দ্রিক নানাতর সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিবাহ রীতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচিত। সেইসঙ্গে মানুষের বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনের পর্যালোচনা ও বর্তমানকাল পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কের বিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে ঔপন্যাসিকদের চিন্তা-চেতনা ও মননের প্রকাশ সাহিত্যে কতটা পরিমানে ধরা পড়েছে তাই আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসগুলিতে মূলত কিরূপ দাম্পত্য সম্পর্ক আছে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তাঁর গোটা ঔপন্যাসিক জীবনের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্নতা ও উৎকৃষ্টতার অনুসন্ধান করা হয়েছে। মূলত একজন মরমী কথাকার হিসেবে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ কিরকম দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং কতটাই বা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে; মূলত তাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিকদের থেকে আলোচ্য বিষয়ে কতটা স্বতন্ত্র ছিলেন, সেকথাও অনেকাংশে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নিরিখে নারীর জীবনের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করে, সূত্রাকারে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত বাঙালী ঘরের নারীকে কন্যা, জায়া, জননী হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু তার পেছনে কি থাকে পুরুষ শাসিত সমাজের মূল উদ্দেশ্য, তাই আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। একজন নারী যেমন সম্পর্কের সৃষ্টিদাত্রী তেমনি আবার ধ্বংসের প্রতিমূর্তি। নারীর বিচিত্র রূপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে নারীসত্তা নির্মাণে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ কতটা সফল, তাই মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁকে সাহিত্য সমালোচকরা অনেক ক্ষেত্রে ‘রান্নাঘরের লেখিকা’ বলেছেন। তার কারণ তিনি যত সূক্ষ্মভাবে ও মুরতি মনে নারী জীবনের বিশ্লেষণ করেছেন; অন্য কোন ঔপন্যাসিক তেমনভাবে তা করতে পারেননি। আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁর সফলতা ও অন্য ঔপন্যাসিকদের কার্য কুশলতার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। নারীর বিভিন্ন রূপের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে আসলে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতকেই স্পষ্ট করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণে তুলনামূলক আলোচনা নির্দেশিত হয়েছে। মানুষের দাম্পত্য জীবন প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে তুলনায় কতটা ভিন্নতা আছে, তাই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ‘পুরুষ ঔপন্যাসিক’ ও ‘নারী ঔপন্যাসিক’ দুটি পর্বে বিভক্ত করে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কারণ পুরুষ ঔপন্যাসিকরা দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্রকল্প রচনায় যেখানে কলম থামিয়ে দিয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে নারী ঔপন্যাসিকরা সেখান থেকে শুরু করেছেন। তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে মানুষের দাম্পত্য জীবনের ভিন্নতা ও

ঔপন্যাসিকদের রচিত সাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্ক কেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপসংহার অংশে গবেষণা বিষয়ের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণার সময়কালের অভিজ্ঞতা ও জীবনাবিজ্ঞা আলোচ্য অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেভাবে প্রতিদিন মানুষের সম্পর্কগুলো ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে, খুব সহজে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিচ্ছে। মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা ভুলে যাচ্ছে, প্রতি ক্ষেত্রেই একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলছে। এসবের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের কী করা উচিত? তা গবেষণার প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রেক্ষিতে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের জীবনাচরণের সঠিক পথ নির্দেশিকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অংশে মূলত 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসের প্রেক্ষিতে এবং গবেষণা সন্দর্ভের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

*****

তথ্যসূত্র:-(১) সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪র্থ সং, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৮৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪.